Study Material for Semester- Vi
Paper – International Relation after 2nd World War
Given By- Suvendu Saha, (Assistant Prof) Dept. of Historty,
Bidhan Chandra College, Asansol

দ্বিমেরুবাদ-এর হ্রাস বা দাঁতাত কি এবং দাঁতাতের কারন

দুই মেরুকরণ বিশ্বে বিভক্ত রাষ্ট্র গুলি ক্রমশ পারমানবিক শক্তিতে শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। বিশ্বের বুকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ছায়া ক্রমে ঘনীভূত হয়েছিল। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে মানবজাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এই ভয় বিশ্বের শান্তিকামী মানুষকে বিচলিত করেছিল। দ্বিমেরুকরন রাজনীতির প্রভাব এশিয়াতেও বিস্তার লাভ করেছিল। দ্বিমেরুবাদ বিশ্বযুদ্ধোত্তর রাজনীতির স্থায়ী বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু ছয়ের দশক থেকে ধীরে ধীরে দ্বিমেরুকরণ রাজনীতির ভয়াবহতা কমতে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে যে মতাদর্শগত লড়াই এবং পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস ও সন্দেহ ছিল তার অবসান ধীরে ধীরে ঘটতে থাকে। এই ঘটনাকে বলা হয় দাঁতাত (Detente) বা বিবাদাবসান।

এর পিছনে যেসকল কারনগুলি ছিল সেগুলি হল নিম্নরূপ –

(১) এশিয়া ও আফ্রিকার যে সকলদেশ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর স্বাধীনতা লাভ করেছিল। তাদের অধিকাংশ রাষ্ট্রই এই দ্বিমেরুকরণ রাজনৈতিক শিবিরে যোগ দিতে চায়নি। ঔপনিবেশিক শাসনের অভিজ্ঞতা থেকে তারা এই শিক্ষা নিয়েছিল যে কোন শিবিরে যোগ দেওয়ার অর্থ পুনরায় পরাধীনতা কে বরন করা। তারা পারমানবিক শক্তির ভয়ে ভীত না হয়ে স্বাধীনভাবে পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণে অগ্রসর হয়। তারা একধরনের নতুন পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করেছিল যাকে বলা হয় জোট নিরপেক্ষতা নীতি। এই নীতি দ্বিমেরুবাদের উপর জোর আঘাত ছিল। জোট নিরপেক্ষ নীতির প্রভাবে দ্বিমেরুকরণ রাজনীতির পাণ্ডারা বিশেষকরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের কর্ণধাররা নিজেদের মধ্যে সমঝোতায় আসতে বাধ্য হয়েছিল।

(২)মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিম ইউরোপের পুঁজিবাদী দেশগুলোকে নিয়ে যে শিবির তৈরি করেছিল এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন সাম্যবাদী দেশগুলোকে নিয়ে যে পাল্টা শিবির তৈরি করেছিল তা শেষ পর্যন্ত বজায় থাকেনি। উভয় শিবিরেই ভাঙন ধরেছিল। পশ্চিম ইউরোপের অনেক রাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের

দাদাগিরিকে মানতে রাজী হয়নি। বিশ্বযুদ্ধের আঘাতে জর্জরিত অনেক দেশ বাধ্য হয়ে মার্কিনীদের সাহায্য নিয়েছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে তারা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে উন্নতি লাভ করেছিল এবং তাদের নিরাপত্তাও সুনিশ্চিত হয়েছিল। তারা মার্কিন বলয় থেকে মুক্তি কামনা করে নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে আন্তর্জাতিক আঙিনায় প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্স এই দুই দেশ আণবিক শক্তির মর্যাদা লাভ করেছিল। ১৯৫৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুমতির উপর নির্ভর না করেই ঐ দুই দেশ মিশরের বিরুদ্ধে সুয়েজখাল জাতীয়করণের প্রতিবাদে বল প্রয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। ৬০ এর দশকে ফ্রান্স নিজের দেশ থেকে এবং প্রায় সমস্ত পশ্চিম ইউরোপ থেকে মার্কিন প্রভাবকে দূর করার জন্য প্রচেষ্টা চালায়। ফরাসী রাষ্ট্রপতি দ্য গলের এই উদ্যোগ মার্কিন শিবিরে ভাঙন ধরায়।

অনুরুপ ভাবে সোভিয়েত শিবিরেও ঐক্য বজায় ছিলনা। পূর্ব ইউরোপকে কেন্দ্র করে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বিরোধ শুরু হলে সোভিয়েত নেতৃত্ব দুর্বল হয়। পূর্ব ইউরোপের সাম্যবাদী বহুদেশ সোভিয়েত প্রভুত্বকে মানতে রাজী ছিলনা। যুগোশ্লাভিয়া তার সেরা উদাহরণ। মার্শাল টিটোর নেতৃত্বে যুগোশ্লাভিয়ার সঙ্গে সোভিয়েত রাশিয়ার বিরোধ শুরু হয়। পরিনতিতে ১৯৪৮ সালের মে মাসে যুগোশ্লাভিয়াকে কমিউনিস্ট শিবির থেকে বহিষ্কার করা হয়। পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, চেকোশ্লোভাকিয়া, রোমানিয়া ইত্যাদি দেশেও সোভিয়েত নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়। পরিণতিতে উভয় জোট নিজেদের স্বার্থে দ্বিমেরুকরণ রাজনীতির দ্বন্দ্ব পরিহারে বাধ্য হয়।

(৩) আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ধারনা ছিল পারমানবিক ও বিধ্বংসী বিপুল অস্ত্র তৈরি করে সে তার শিবিরভুক্ত রাষ্ট্রগুলির নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করতে পারবে। কিন্তু তার এই ধারনা যে কত ভুল তা আমেরিকা পরবর্তী কালে টের পায়। আমেরিকা দেখে যে তার বিরোধী পক্ষও সমানভাবে তৈরি হয়েছে। সামরিক পেশী দেখিয়ে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয় আমেরিকা বুঝতে পেরেছিল। সোভিয়েত রাশিয়া তার থেকে প্রযুক্তিগত উন্নয়নেও যে পিছিয়ে নেই আমেরিকা তা অনুভব করেছিল। তাই আমেরিকা বিবাদ মেটাতে অর্থাৎ দাঁতাতে আগ্রহ দেখায়।

(৪)জাপানের ক্ষমতা বৃদ্ধি দুই শিবিরের নেতাকে দাঁতাতে আগ্রহী করেছিল। আন্তর্জাতিক বানিজ্য ও মোট জাতীয় উৎপাদনে আমেরিকা জাপানের পিছনে চলে যায়। আন্তর্জাতিক বানিজ্যের এক বৃহৎ অংশ জাপানের নিয়ন্ত্রনে চলে গিয়েছিল। এমনকি খোদ মার্কিনী বাজারেও জাপানের পণ্যের উপস্থিতি মার্কিনীদের ভাবিয়েছিল। প্রযুক্তিবিদ্যাতেও জাপানের অগ্রগমন মার্কিনীদের সচেতন করেছিল। তারা অনুভব করেছিল দুই মহা শক্তিধর দেশ ঠাণ্ডা যুদ্ধে নিজেদের শক্তিকে ক্ষয় করেছে। সুতরাং বিশ্বের বাজারে নিজেদের স্থান প্রতিষ্ঠিত করতে হলে প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় কমাতে হবে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে জাপানের সাফাল্য দুই বড় শক্তি কে বাধ্য করেছিল দাঁতাতের পথে যেতে।

(৫) NATO –র সদস্যদের আচরণও দ্বিমেরুকরণ রাজনীতির প্রভাব হ্রাসের আর এক কারন। এদের বক্তব্য ছিল ইউরোপের সামরিক নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করতে হলে নিজেদের উদ্যোগী হয়ে সামরিক শক্তি কমাতে হবে। নিজেদের মধ্যে ব্যবসা বানিজ্য বৃদ্ধি করতে হবে। সারা ইউরোপে সহযোগিতার বাতাবরণ তৈরি করতে হবে। আমেরিকার ছাতার তলায় দাঁড়িয়ে চিরকাল চলা সম্ভব নয় তা বুঝতে NATO –র সদস্যদের বুঝতে দেরি হয়নি।

(৬) স্তালিনের মৃত্যুর পর ক্ষমতায় এসেছিলেন নিকিতা ক্রুশ্চেভ তিনি শান্তিপূর্ণ সহবস্থানের নীতি অনুসরণ করেছিলেন তার মনোভাব দ্বিপাক্ষিক রাজনীতির উপর প্রভাব ফেললে এর চরিত্র পাল্টে গিয়েছিল তা বলাই বাহুল্য। তাঁর জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অনেক কাছাকাছি এসেছিল। পারমানবিক যুদ্ধের ভয়, মার্কিন অর্থনীতির সংকট, পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোর সঙ্গে বানিজ্যিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে সোভিয়েত ইউনিয়নের আগ্রহ উভয় শিবিরের মধ্যে জমানো বরফকে গলাতে সাহায্য করেছিল। এই ভাবে দ্বিমেরুকরণ রাজনীতির প্রভাবে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস, সন্দেহ ও আতঙ্কের যে বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল তার হ্রাস ধীরে ধীরে হয়।

দ্বিমেরুকরণ রাজনীতির প্রভাব হ্রাস অবশ্যই বিশ্বের শান্তিকামী মানুষের কাছে স্বস্তির কারন। দুই শিবিরের মধ্যে বিবাদের অবসান বিশ্বের প্রতিটি শান্তিকামী মানুষ চেয়েছিলেন। সংঘর্ষ বা উত্তেজনা ছড়ালে একমাত্র যুদ্ধবাজদেরই লাভ হয়। মনে রাখতে হবে দুই শিবির সাধারন মানুষের স্বার্থে তাদের বিবাদ মেটাতে উদ্যোগ নেয়নি। নিজেদের স্বার্থেই তারা দাঁতাতের পথে এগিয়ে এসেছিল। তারা বুঝেছিল পারমানবিক যুদ্ধ শুরু হলে কোন পক্ষই বাঁচবে না। এই আতঙ্কই তাদের যুদ্ধের থেকে মুখ ফেরাতে বাধ্য করেছে। ঐ দুই রাষ্ট্রের মধ্যেই আজ পারমাণবিক অস্ত্র সীমাবদ্ধ নয়। চীন, ফ্রান্স, ব্রিটেন পারমানবিক অস্ত্র তৈরি করেছে। এসবের পরিণতিতে বিশ্বরাজনীতি থেকে দ্বিমেরুকরণের প্রভাব কমতে শুরু করেছিল।